খসড়া অবস্থান পত্র
কোস্ট ফাউন্ডেশন, ১৯ জুন, ২০২২ (সিরডাপ মিলনায়তন, তোপখানা রোড, ঢাকা)
জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ঃ টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় ও পর্যাপ্ত জলবায়ু অর্থায়নের প্রেক্ষাপট

১. প্রস্তাবিত জাতীয় বাজেট ২০২২-২৩ ও খাতওয়ারী চিত্র

"কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় প্রত্যাবর্তন " প্রতিশ্রুতি দিয়ে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকার প্রস্তাবিত বাজেট উপস্থাপন করেছে সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়। প্রস্তাবিত এই বাজেটে জিডিপি'র প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৭ দশমিক ৫ শতাংশ আর মূল্যস্ফীতি ৫ দশমিক ৫ শতাংশ। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটের আকার ২০২১-২২ অর্থবছরের তুলনায় ৭৪ হাজার ৩৮৩ কোটি টাকা বেশি। বাজেটে জিডিপি'র প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪৪ লাখ ৪৯ হাজার ৯৫৯ কোটি টাকা এবং মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে ৪ লাখ ৩৩ হাজার কোটি টাকা। বাজেটে মোট ঘাটতির পরিমাণ অনুমান করা হয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৬৪ কোটি টাকা। ২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এডিপিতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ লাখ ৪৬ হাজার ৬৬ কোটি টাকা। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে সরকারের ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩০৫৩১ কোটি টাকা, যা মোট জাতীয় বাজেটের ৪.৫%, ২৫টি জলবায়ু সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দের ৮.০৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র ০.৬৯%।

২. বাজেটের গতানুগতিক প্রবৃদ্ধি ও নীতি-কৌশলের পরিবর্তন কোথায়

বাংলাদেশের প্রথম বাজটেরে আকার ছিলো ৭৮৬ কোটি টাকা এবং মাথা পিছু আয় ছিলো ৮৮ ডলার, বর্তমান সরকারের ৫১তম বাজেটের আকার দাড়িয়েছে ৬ লাখ ৭৮ হাজার ৬৪ কোটি টাকা এবং মাথা পিছু আয় বেড়েছে ২৮২৪ ডলারে। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে এবং সেইসাথে জিডিপি বাড়ছে এবং প্রাসংঙ্গিকক্রমে বাজেটের আকারও গতানুগতিকভাবেই বাড়ছে। সরকার প্রতি বছর রেকর্ড পরিমান বাজেট দিচ্ছেন। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমরা রেকর্ড বাজেট দিয়ে এবং তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি টেকসই অর্থনীতি অর্জন করতে পেরেছি কি না। প্রশ্ন হচ্ছে ৫০ বছর পার হলেও আমাদের দেশে দারিদ্রতার হার সত্যিকার অর্থে কি পরিমান হ্রাস পেয়েছে? আর্থ-সামাজিক বৈষম্য কমেছে না বেড়েছে? উত্তর এখানে খুবই পরিষ্কার। রেকর্ড বাজেট আমাদের দেশে দারিদ্রতার পরিমান হ্রাস করতে পারে নাই। বরং বলতে পারি যে কথিত প্রবৃদ্ধি-তাড়িত নীতি কৌশলের আলোকে সরকার যে বাজেট দিচ্ছেন এবং বাস্তবায়ন করছেন তা দারিদ্র দূরীকরনে সহায়ক নয় বরং সৃষ্ট দারিদ্রকে অনেকটা ধামাচাপ দেওয়ার কৌশল মাত্র। তাই স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও এই গতানুগতিক প্রবৃদ্ধি আমাদের জিডিপি ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন হলেও আমাদের কাংখিত প্রত্যাশাকে পূরণ করতে পারছেনা।

৩. আর্থ-সামাজিক বৈষম্য একটি টেকসই অর্থনীতির প্রতিফলন হতে পারে না

অর্থনীতিবীদ ও বিশ্লেষকদের মতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে মূলত দারিদ্র দূরীকরনের প্রেক্ষাপটে বিবেচনা করা হয় তাই তাদের পরামর্শ হচ্ছে দারিদ্রবান্ধব খাতগুলোতে সরকারী বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা। অথচ বাস্তবতার চিত্র প্রায় উল্টো, বরাবরের মতো এবারেও এই খাতগুলোকে উপক্ষো করে কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের লক্ষ্য করে অধিকতর বাজেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং দারিদ্রতা হ্রাসের প্রধান সুচক হচ্ছে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস পাওয়া এবং এই সূচকে সাফল্য পেতে হলে সরকারকে শিক্ষা,স্বাস্থ্য, কৃষি, পানি ও পয়নিষ্কাশন কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার মতো গুরত্বপূর্ণ দরিদ্রবান্ধব খাতগুলোতে গতানুগতিক ধারার পরিবর্তে কাংখিত মাত্রার বরাদ্দের প্রয়োজন ছিল যা করা হয়নি। ফলে প্রবৃদ্ধি-তাড়িত নীতি কৌশলের পাশ্ব প্রতিক্রিয়া হিসাবে আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ক্রমান্বয়েই বাড়ছে এবং তা সামাল দিতে সরকারকে প্রতি বছর কথিত "সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচি" এর মত খাত সৃষ্টি করে দারিদ্রতা সামাল দিতে হচ্ছে।

টেকসই অর্থনীতির আরও একটি সূচক হচ্ছে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় সম্পদ আভ্যন্তরীন খাত থেকে যোগান দেওয়া। আমরা অনেক ধনী দেশ যারা এই প্রবৃদ্ধি-তাড়িত নীতি কৌশলের সাথে কল্যানমুখী অর্থনীত চর্চা করছেন তাদের ক্ষেত্রে দেখছি প্রয়োজনীয় সম্পদ আভ্যন্তরীন খাত থেকে যোগান নিশ্চিত করছেন। যেহেতু প্রবৃদ্ধি-তাড়িত অর্থনৈতিক কার্যাবলী বর্জুয়া/ব্যবসায়ীক জনগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল তাদের আয়ের উপর মোটা দাগের কর আরোপের [আয়ের ৫০-৭০ শতাংশ পর্যন্ত] মাধ্যমে সম্পদ সংগ্রহ করছেন এবং সেটা জনগনের কল্যানে ব্যয় করছেন। বাংলাদেশে তার উল্টা পরিস্থিতি দেখা যাচ্ছে। বর্জুয়া/ব্যবসায়ীক জনগোষ্ঠীর চাপের মূখে সরকার তাদের কর হ্রাস সহ সকল বাজেট সুবিধা প্রদান করছেন। ফলস্বরূপ সম্পদ সংগ্রহে ব্যর্থ হয়ে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর উপর করারোপের সুযোগ খুজছেন, পাশাপাশি বাজেট বাস্তবায়নে ঋণের [আভ্যন্তরীন ও বিদেশী ঋণ] পক্ষে কথা বলছেন। আমরা ইতিমধ্যেই ২০২২-২৩ অর্থবছরের ঋণের সুদ বাবদ বাজেটের প্রায় ১২ শতাংশ [৮০৩৭৪ কোটি টাকা] অর্থ খরচের প্রস্তাব দেখেছি। এ খরচ স্বাস্থ্য ও প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষা খাতের সম্মিলিত বাজেটের চাইতেও বেশী। ২০২৫ সাল থেকে মেঘা প্রকল্পসমুহের ঋণ পরিশোধ শুরু হলে সুদ বাবদ সরকারের এই বাজেট সামনে আরও বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ নাই।

৪. টেকসই অর্থনীতি ও বাংলাদেশে জলবায়ু অর্থায়নের প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই [UN-ECOSOC] নির্ধারিত আর্থিক ও পরিবেশগত মানদন্ড অর্জন করে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ইকোসক এর নির্ধারিত পরিবেশগত মানদন্ড অর্জনের ক্ষেত্রে কতটা বাস্তবতার উপর এবং কতটা পরিসংখ্যানিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে অর্জিত

হয়েছে। ইকোসক এর পরিবেশগত ঝুঁকি সূচকের যে ৪টি মানদন্ড রয়েছে সেগুলো হচ্ছে উপকূলীয় এলাকায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, খরা প্রবন অঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা, কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থার অস্থিতিশীলতার মাত্রা এবং দুর্যোগের শিকার হয় বা হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা।

প্রসঙ্গত; উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের সরকারী হিসাবেই প্রায় ২০-২৫ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী উপকূলীয় অঞ্চলের অধিক ঝুকিঁপুর্ন এলাকায় বাস করে। এক্ষেত্রে সরকারের পরিসংখ্যান যদিও বলছে উপকূলীয় অঞ্চলের সুরক্ষায় পর্যাপ্ত বাঁধ রয়েছে কিন্তু বাস্তবতায় সেগুলোর বেশিরভাগই পায়ে হাটার পথের মত, মোটেই দুর্যোগ সহনশীল নয়, এগুলোর গড় উচ্চতা কোথাও ৩ ফুট আবার কোথাও ৫ ফুট। কৃষি ক্ষেত্রেও উপকূলের দুর্দশা অবর্ননীয়। ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, লবনাক্ততা ও জলাবদ্ধতা কারনে কৃষির উৎপাদন ক্রমহ্রাসমান। জীবন-জীবিকার সংকটে পরে মানুষ উপকূল থেকে শহরে স্থানান্তর হচ্ছে এবং আরও কঠিন সংকটের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। উপকূলের বাইরেও বিশেষ করে নদী ভাঙ্গন, হাওর অঞ্চলে অকাল বন্যা কৃষি উৎপাদনকে ক্ষতিগ্রস্থ করছে এবং খাদ্য সংকট সৃষ্টি করছে। জাতিসংঘের গবেষনা প্রতিবেদন বলছে, বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৩২০ কোটি ডলার বা ২৫ হাজার ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়, যা মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) ২ দশমিক ২ শতাংশ। এই ধরনের ক্ষয়-ক্ষতির চিত্র টেকসই উন্নয়নকে প্রতিফলন করে না। এই পরিংখ্যান ভিত্তিক অর্জন জাতিসংঘের মানদন্ডে অর্জিত হলেও বাস্তবাতর প্রেক্ষিতে কোটি কোটি জনগোষ্ঠীকে অরক্ষিত ও ঝুঁকিপূর্ন অবস্থায় রেখে টেকসই উন্নয়ন কতটা সম্ভব সেটাও যথেষ্ট বিবেচনার দাবি রাখে।

৫. সরকারের বিভিন্ন কৌশলগত পরিকল্পনাসমুহও জলবায়ু অর্থায়নের প্রয়োজনীয়তাকে সমর্থন করে

ক. বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল এবং কর্ম পরিকল্পন'র (বিসিসিএসএপি ২০০৯) মূল উদ্দেশ্য অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন। বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিশ্রুতি সাড়া প্রদানের অংশ হিসেবে ২০০৮ সালে এটি প্রণয়ন করা হয় যা ২০০৯ সালে সংশোধিত হয়। এতে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলার কাঠামো উপস্থাপন করা হয়েছে। ছয়টি থিমেটিক এরিয়া বা স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত ১০ বছর মেয়াদী এই পরিকল্পনা কাঠামোটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ায় কাঠামোটি হালনাগাদ করার কাজ চলছে। বিসিসিএসএপি'র আর্থিক প্রক্ষেপন অনুযায়ী শুধু মাত্র অভিযোজন খাতে প্রতি বছর সরকারের ৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রতিশ্রুতি রয়েছে।

খ. "ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" বাংলাদেশকে ২০৩০ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীতকরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্য মাত্রা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে খাদ্য ও পানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ২০৩০ সাল পর্যন্ত মোট ৩৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার [২৯৭০০০ কোটি টাকা] অর্থের প্রয়োজন হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। সরকারের এই পরিকল্পনাকে সমর্থন করে বিশ্ব ব্যাংকের স্বতন্ত্র গবেষনা বলছে যে, ২০৫০ সাল নাগাদ জলবায়ু পরিবর্তনের সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলায় শুধুমাত্র

গত ৫ বছরের জলবায়ু সম্পৃক্ত বাজেট বিশ্লেষণ

অর্থবছর	মোট জাতীয় বাজেট কোঃ টাঃ	মোট জলবায়ু বাজেট	জিডিপি'র %
২০১৮-১৯	৪৬৪৫৭৩	১৮৯৪৮.৭৬	০.৭৫%
২০১৯-২০	৫২৩১৯০	২৩৫৩৮.৩২	০.৮২%
২০২০-২১	৫৬৮০০০	২৪০৭৫.৬৯	০.৭৬%
২০২১-২২	৬০৩৬৮১	২৫১২৪.৯৮	০.৭৩%
২০২২-২৩	৬৭৮০৬৪	৩০৫৩১.৯৯	০.৬৯%

তথ্যের উৎস: বিভিন্ন অর্থবছরের জলবায়ু অর্থায়ন বাজেট প্রতিবেদনসমূহ

অভিযোজন খাতেই প্রতিবছর প্রায় ৫.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪৯,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে। উক্ত পরিকল্পনায় বিনিয়োগ ও অর্থায়ন প্রসঙ্গে প্রতি বছর জিডিপি'র ২.৫ শতাংশ বরাদ্দের উল্ল্যেখ করা হয়েছে যেখানে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে ২ শতাংশ এবং বাকি ০.৫ শতাংশ বেসরকারি উদ্যোগ থেকে।

গ. বাংলাদেশ ন্যাশনালি ডিটারমাইন্ড কন্ট্রিবিউশন (এনডিসি-২০২১) পরিকল্পনায় অভিযোজন সক্ষমতা অর্জন ও গ্রিনহাউজ গ্যাস নি:সরণের লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে। বাংলাদেশের নিজস্ব সক্ষমতা ও উন্নত বিশ্বের সহযোগিতায় ২০৩০ সালের মধ্যে ২১.৮৫ শতাংশ কার্বন নির্গমন হ্রাসের অঙ্গিকার ব্যাক্ত করেছে। উল্ল্যেখিত উদ্যোগসমূহ বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যায়ের ধারানাও অন্তর্ভুক্ত করেছে তারমধ্যে এনার্জি, কৃষি, বনায়ন, ভূমি এবং বর্জ্য খাতে শর্তহীন বিনিয়োগ এর পরিমান প্রায় ৩২.২৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, এবং শর্তযুক্ত বিনিয়োগ এর পরিমান প্রায় ১৪০.৯৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। সেই হিসেবে প্রতি বছর সরকারের শর্তহীন বিনিয়োগে ৩.৫৮ বিলিয়ন [৩০ হাজার ৭ শত ৮৮ টাকা] এবং শর্তযুক্ত বিনিয়োগে ১৫.৬৬ বিলিয়ন [১ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬ শত ৭৬ কোটি টাকা] ডলার বরাদ্দের প্রয়োজন রয়েছে।

ঘ. জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনায় [NAP 2050] ১৪ টি জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি চিহ্নিত করা হয়েছে যার মধ্যে রয়েছে, চরম উষ্ণতা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদ-নদী সৃষ্ট বন্যা, নদী ভাঙন, খরা, ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাস, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা বৃদ্ধি, আকস্মিক বন্যা, ভূমিধ্বস, তীব্র শীত, বজ্রপাত, শহরাঞ্চলের বন্যা এবং সমুদ্রের অম্লায়ন। ইতমধ্যে পরিবেশ,বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় খসড়া চুড়ান্ত করেছে, এর মেয়াদ ২০৫০ সাল পর্যন্ত। এই পরিকল্পনার আনুমানিক খরচ ৮৪ বিলিয়ন ডলার সেই হিসেবে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৩ বিলিয়ন ডলারের [২৫ হাজার ৮ শত কোটি টাকা] অর্থায়ন প্রয়োজন হবে।

৬. সরকারের প্রতিশ্রুত অর্থায়ন ও বাস্তব ভূমিকায় ফারাক

সরকার জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ও ভবিষ্যত নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলার উদ্দেশেই উপরোক্ত সকল পরিকল্পনা প্রনয়ন করেছে বলে আমাদের মনে করতে হবে এবং অর্থায়নের প্রাক্কলন ও প্রতিশ্রুতিও বাস্তবসম্মত। সুতরাং এসকল পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সরকারকে প্রতি বছর কমপক্ষে ৯৮১০০ কোটি টাকা যা জিডিপি'র ২.২০ শতাংশ। বিপরীতে সরকার প্রতি বছর জলবায়ু অর্থায়নে বরাদ্দ দিচ্ছে জিডিপি'র ১.০০ শতাংশেরও অনেক কম এবং তা ক্রমহাসমান।

প্রস্তাবিত বাজেটে ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দে মাত্র ৩০,৫৩১ কোটি টাকা রাখা হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৮.০৭ শতাংশ এবং জিডিপি'র মাত্র ০.৬৯%। বিগত ৫ বছরের সরকারের জলবায়ু অর্থায়ন প্রতিবেদনে জলবায়ু সম্পৃক্ত বরাদ্দ পর্যালোচনায় ক্রমবর্ধমান হারে বরাদ্দ হ্রাসের চিত্রই আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিশেষজ্ঞদের মতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বর্তমানের এই বরাদ্দ ঝুঁকি মোকাবেলায় যথেষ্ট নয় এবং ভবিষ্যতে যে ঝুঁকি সৃষ্টি হবে বলে অনুমান করা হচ্ছে তা মোকাবেলায় যথেষ্ট অপ্রতুল।

৭. জাতীয় বাজেটে ও জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে সরকারের কাছে আমাদের সুপারিশসমূহ

ক. জলবায়ু অর্থায়নে সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জিডিপির কমপক্ষে ০২ শতাংশ বরাদ্দ ও বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে

সরকার ২০১৫ সাল থেকে প্রতি বছর জাতীয় বাজেটে জলবায়ু অর্থায়ন নামে নতুন এবং আলাদা বরাদ্দ দিয়ে আসছে। এখানে উল্লেখ্য যে জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়টি আসলে নতুন কিছু নয়। কারন ২০-২৫ বছর আগেও জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়টি উন্নয়ন বাজেটের সাথে সমন্বিত ছিল যা বর্তমানে আলাদা করে দেখানো হচ্ছে মাত্র। ২০-২৫ বছর আগেও বরাদ্দ যা ছিল [জিডিপি'র ১% এর কাছাকাছি] এখনোও তাও কমে যাচ্ছে।

এই জায়গাটিতেই বাজেট প্রনয়ন ও বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকারের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন দরকার। জলবায়ু অর্থায়নকে জাতীয় বাজেটে পৃথক করে দেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় আন্তারিক এবং বৈশ্বিক ক্ষেত্রেও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এটা দেখানো। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সরকার জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সরকার জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় অধিক গুরুত্ব দিচ্ছে বললেও বিষয়টি বাজেটে সেভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে না। আমরা মনে করি জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রনীত সকল কৌশলিক পরিকল্পনা টেকসই অর্থনীতি ও দারিদ্র দূরীকরনে অপরিহার্য এবং পরিকল্পনা অনুসারেই জাতীয় বাজেটে জিডিপির কমপক্ষে ০২ শতাংশ বাজেট জলবায়ু অর্থায়নের জন্য বরাদ্দ নিশ্চিত করা উচিৎ।

খ. জলবায়ু পরিবর্তন ও উপকূল সুরক্ষাঃ বাঁধ নির্মান কার্যক্রম সরকারের অগ্রাধিকার বিনিয়োগ খাত হিসাবে অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিৎ

উপকূলীয় সুরক্ষার প্রধান কাঠামোগত উপাদান ও কৌশল হচ্ছে কার্যকর বেরীবাঁধ নির্মান। বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ৬০'এর দশকে বেড়ীবাঁধসমুহ তৈরী হয়েছিল মূলত; সাগরের জোয়ার ও জলোচ্ছাস থেকে রক্ষা কৃষি জমিসমুহ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে। যে কারনে বাঁধের উচ্চতা সাগরের সাধারন জোয়ারাধারকে মাথায় রেখেই ঠিক করা হয় এবং সে অনুসারে নির্মান করা হয়েছিল। তবে সময়ের বিবর্তনে বর্তমানে এসকল বাধেঁর অধিকাংশই বিগত ছয় দশকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে ঝড়-জলোচ্ছাসের কারনে ক্ষতিগ্রস্থ এবং উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে। সরকারের সংরক্ষিত তথ্যানুসারে উপকূলীয় এলাকার বাধেঁর পরিমান প্রায় ৫৫০০ কিঃমিঃ। এসকল বাধঁ সময়মত ও পরিকল্পনা মাফিক মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন করা হচ্ছে না। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের কারন ক্রমবর্ধমান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলোচ্ছাস এসকল বাধেঁর ক্ষয়ক্ষতি আরও বৃদ্ধি করছে। ফলে জনগনের জীবন-সম্পদের ঝুকিঁও বৃদ্ধি পাচ্ছে। **বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে উপকূলীয় এলাকা বাংলাদেশের মোট ভূমির ৩২% এবং ২০৫০ সাল নাগাদ সেখানে জনসংখ্যা দাড়াতে পারে প্রায় ৬০ মিলিয়ন। জনসংখ্যার এই ক্রমবর্ধমান হার মানুষকে অতিবিপদাপন্ন উপকূলীয় এলাকায় অভিবাসন এবং বসবাস করতে বাধ্য হচ্ছে। সুতরাং সরকারের দায়ীত্ব রয়েছে এই বিশাল অভিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে পরিকল্পনা মাফিক সমর্থন দেওয়া যাতে তাদের জীবনযাত্রা অধিকতর নিরাপদ হয়।**

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ও বাঁধের জন্য বরাদ্দ			
অর্থবছর	মোট বাজেট [কোটি]	বাঁধের জন্য বরাদ্দ [কোটি]	উপকূলীয় বাঁধের জন্য বরাদ্দের %
২০১৭-১৮	৫৯২৭	৭৩২	১২%
২০১৮-১৯	৭০৯৩	২৩৪৭	৩৩%
২০১৯-২০	৭৯৩৪	২৪০৪	৩০%
২০২০-২১	৮০৮৯	১৭৯৫	২২%
২০২১-২২	৮৮২৭	১৭৫৭	২০%
২০২২-২৩	১০১৯৬	অস্পষ্ট	
তথ্যসুত্র: জাতীয় বাজেটের সারাংশ এবং পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়'র বার্ষিক বাজেট			

উপকূলীয় এলাকায় বাধঁ নির্মাণ, মেরামত ও ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হচ্ছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়। কিন্তু এই মন্ত্রনালয়ের জন্য প্রতি বছর যে বাজেট বরাদ্দ দেওয়া হয় তা খুবই কম। পানি

সম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বাজেট বিশ্লেষন করে দেখা গেছে যে, বাঁধ ব্যবস্থাপনার তাদের বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সর্বনিম্ন ৭৩২ কোটি থেকে সর্বচ্চো ২৪০৪ কোটি টাকা। এই বরাদ্দ মূলত বাঁধ মেরামত ও ব্যবস্থাপনা খাতের জন্য বরাদ্দ হয়ে থাকে। বাঁধ নির্মানের জন্য তেমন কোন বরাদ্দ নেই। **২০২২-২৩ অর্থবছরে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ের ১০১৯৬ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে উন্নয়ন বাজেটে ৭৯৩৮ কোটি টাকা [বাধঁ নির্মান সহ সকল উন্নয়ন খরচ]। এর মধ্যে বাধঁ নির্মান ও মেরামতের জন্য বরাদ্দ কত তা এখনোও অস্পস্ট। তবে অভিজ্ঞতা হচ্ছে এটা ১৫-২০% এর বেশী হবে না।**

গ. বাঁধ নির্মানের জন্যও পৃথক [১০০০০-১২০০০ কোটি টাকা] বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে

দ্বীতিয়ত; বাঁধ নির্মান এবং মেরামতের মধ্যে প্রকৌশলগত ভিন্নতা রয়েছে। এ জন্য আমরা অনেক সময় বাঁধ মেরামতকেই বাঁধ নির্মান বলে ধরে নেই এবং বাজেটেও বলা হয়ে থাকে বাঁধের জন্য বরাদ্দ। **উপকূল এলাকায় প্রায় ৭০-৮০% [সরকারের তথ্য মতে] বাঁধই জলোচ্ছাস ও জোয়ারের পানি ঠেকানোর অনুপোযোগী। কারন এসকল বাঁধের উচ্চতা পূর্ব থেকেই অনেক কম এবং মানসম্মত মেরামত ও বব্যস্থাপনা নিয়মিত নয়।** যে কারনে জলবায়ু পরিবতনের নেতিবাচক প্রভাব [সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস-জোয়ার বৃদ্ধি] মোকাবেলায় মানসম্মত উচ্চতার টেকসই বেড়ীবাঁধ প্রয়োজন।

বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ ও পোল্ডারের পরিমান প্রায় ৫,৭৫৪ কি:মি: (সরকারী হিসাবে)। এছাড়াও বিভিন্ন চরসমুহে আরও পাঁচ থেকে সাত লাখ দরিদ্র জনগোষ্ঠী বাস করে যেখানে কোন বাঁধ নাই। সব মিলিয়ে **উপকূলে এই মুহুর্তে প্রায় ৬,৫০০ কি:মি: বাঁধ প্রয়োজন এবং সকল বাঁধ আগামী ১০ বছরের মধ্যে টেকসইভাবে নির্মান করতে হলে বিশেষজ্ঞদের হিসাবমতে প্রায় ১৩০,০০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। যার প্রেক্ষিতে প্রতিবছর ১০০০০-১২০০০ কোটি টাকা পৃথক বরাদ্দ করা প্রয়োজন।**

ঘ. জলবায়ু পরিবর্তন বিবেচনায় কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতেও বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজনীয় চাহিদা অনুসারে হতে হবে

প্রতিবছর বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেলেও আনুপাতিক হারে কৃষি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্রবান্ধব খাতগুলোতে বরাদ্দ বাড়ছে না। বলা হয়ে থাকে কৃষি হচ্ছে বর্তমানের নিরাপত্তা আর শিক্ষা চিকিৎসা হচ্ছে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। কোনো দেশের অর্থনীতি এবং উন্নয়নকে যদি টেকসই রূপ দিতে হয়, তাহলে কৃষিকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে হবে। আর ভবিষ্যতের মানবসম্পদ গড়ে তুলতে হলে মানসম্পন্ন শিক্ষা আর আধুনিক চিকিৎসার কোনো বিকল্প নেই। মনে রাখা দরকার দেশের অর্থনীতিতে জিডিপি'র ১৪ শতাংশ হলেও কর্মসংস্থানের ৪০ শতাংশ অবদান এখনো কৃষি খাতের।

কোস্ট ফাউন্ডেশন
যোগাযোগ; আমিনুল হক। ০১৭১৩৩২৮৮১৫

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত
অভিঘাতে কৃষির উৎপাদন ব্যবস্থা এবং খাদ্য নিরাপত্তা যখন দেশের প্রধান উদ্বেগের বিষয় তখন প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি খাতে [মৌলিক কৃষি অর্থাৎ শুধুমাত্র খাদ্য শষ্য উৎপাদন] বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৪ হাজার ২শত ২০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩.৫৭ % এবং জিডিপি'র ০.৫৪%। বিশেষজ্ঞরা বলছে দীর্ঘমেয়াদি নীতিকৌশল গ্রহণ করে কৃষি খাতকে টেকসই করার উদ্যোগ নেয়া এখন সময়ের দাবী।

জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় কৃষিখাতের মান উন্নয়নে গবেষণা ও উদ্ভাবনী প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বাড়াতে হবে, উপকূলীয় অঞ্চল সহ,খরা ও বন্যা প্রবন অঞ্চলে জলবায়ুসহিষ্ণু বীজ উৎপাদন, সম্প্রসারণ ও প্রযুক্তিনির্ভরতার বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দিতে হবে। বিপূল জনসংখ্যার এই দেশে ভবিষ্যতের খাদ্য ও অর্থনৈতিক ঝুঁকি'র সংকট মোকাবেলায় অগ্রাধিকার অভিযোজন খাত বিবেচনায় এই খাতে প্রস্তাবিত বাজেটের নুন্যতম ৭ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

করোনা মহামারি দেখিয়ে দিয়েছে আমাদের স্বাস্থ্যব্যবস্থার দুর্বলতা অথচ এত আলোচনার পরও স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ প্রস্তাবিত বাজেটের ৫ শতাংশের বেশি বাড়ছেই না। সাধারন মানুষের জন্য নুন্যতম স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে মোট বাজেটের ১০-১২ শতাংশ বরাদ্দ রাখার কথা বলা হলেও এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে রাখা হয়েছে মাত্র ৪.৩২%, সুতরাং স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক মানদন্ডে পৌছাতে হলে প্রস্তাবিত বাজেটে স্বাস্থ্যখাতের বরাদ্দ বাড়ানো উচিৎ নুন্যতম ১০-১২ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

করোনা মহামারি সবচেয়ে বেশি আঘাত হেনেছে শিক্ষাব্যবস্থায়, বিভিন্ন জরিপে দেখা যায় ৩৫% শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে এবং ১৬% আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ফিরতে পারে নাই (বিআইজিডি গবেষণা)। অথচ বাজেটে এই ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ অনুপস্থিত। জলবায়ু পরবির্তনের কারনে উপকূলীয় এলাকায় বাস্তুচ্যুতি ও স্থানান্তর বেশী এবং বেকারত্বও বেশী। বেকার জনগেষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা অত্যন্ত জরুরী। দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি না হওয়ায় দেশে শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে। বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৮১ হাজার ৪ শত ৪৯ কোটি টাকা যা জিডিপ'র ১.৮৩ শতাংশ। শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দের দিক থেকে বাংলাদেশ হচ্ছে এলডিসি দেশগুলোর মধ্যে চতুর্থ সর্বনিম্ন দেশ। শিক্ষার সামগ্রিক মান উন্নয়নে জাতিসংঘের কাংখিত মানদন্ডে পৌছাতে হলে এখন থেকেই বরাদ্দ বাড়ানো প্রয়োজন, সেক্ষেত্রে বরাদ্দ হওয়া উচিৎ জিডিপি'র নুন্যতম ৫ শতাংশ বরাদ্দ নিশ্চিত করতে হবে।

participates
in survival strategies
of coastal poor

COAST Foundation